মনে মনে প্রধানমন্ত্রী

আবিদ ইকবাল

সত্যায়ন
প্রকাশন

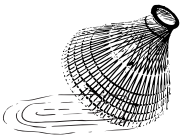

যা আছে

জোড়া খুন / ৯

ফন্দি / ৪৫

ছাড় নেই / ৫৫

হিজড়া চেনেন? / ৯০

নাচেরে মিডিয়া নাচে / ৯৯

মাতাল হাওয়া / ১১৪

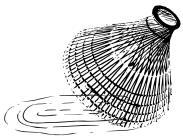

মাতাল হাওয়া

সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই। কলেজের রানির দীঘির পাড়। অন্য দিনগুলোতে এ সময় ভিড় লেগে থাকে। মানুষে গিজগিজ করে। আজ অনেকটাই ফাঁকা। এরকম ফাঁকা ফাঁকা লাগছে কেন—নিজে নিজেই জিজ্ঞেস করে ফারিহা। আরও কিছুটা সময় বসে থেকে ফেরার পথ ধরে। ফারিহা থাকে দৌলতপুর। কলেজ থেকে হেঁটে যেতে সাকুল্যে পাঁচ-সাত মিনিট লাগে। ওর একটা রুটিন হলো, যত কাজই থাকুক সন্ধ্যার পরে কখনো বাইরে থাকে না।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ইংরেজি বিভাগে পড়ে ফারিহা। এবার তৃতীয় বর্ষে পা রেখেছে। বাড়ি ছেড়ে প্রথম যেদিন কলেজে পাড়ি জমায়, মা তার কাছ থেকে তিনটি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। প্রথম প্রতিশ্রুতি : সন্ধ্যার পরে কখনো বাইরে থাকা যাবে না। দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি : কখনো বোরকা আর নিকাব ছাড়া যাবে না। তৃতীয় প্রতিশ্রুতি :

সব সময় চোখ-কান খোলা রেখে চলবে।

সেদিন থেকে মায়ের তিনটি কথাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে ফারিহা। তবে মায়ের তিন নম্বর কথাটি এখনো ওর কাছে বেশ রহস্যময় লাগে। দার্শনিক উক্তির মতো মনে হয়। তিনটা বছর কেটে গেল কলেজে। কই, কোনো স্যার তো এমন করে বলেননি। কোনো ম্যাডাম তো ওভাবে বলেননি। মা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। হাল আমলে যেটাকে শিক্ষার কাতারেই গোনা হয় না। অথচ তিনি কেমন করে জানলেন, আজকাল বাঁচতে হলে চোখ-কান খোলা রেখে চলতে হয়?

ফারিহা চলতে-ফিরতে সব ক্ষেত্রে মায়ের ওই কথাটির সত্যতা টের পায়। একজন নারীর জন্য কত রকমের ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছে, কত দিক থেকে হায়েনা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে, তা ভেবে কূলকিনারা করা সম্ভব নয়। যেন সুযোগ পেলেই খামচে ধরে নিয়ে যাবে। এটা ফারিহা যে কেবল অনুভব করে তা নয়। চোখের সামনেও ঘটতে দেখেছে। প্রতিনিয়ত ফাঁদে আটকা পড়ছে একটার পর একটা ছাত্রী, গার্মেন্টস কর্মী, নারী-চাকুরিজীবী। ভাবতে গেলে ফারিহার গা শিউরে ওঠে। ভয়ে গায়ে কাঁটা দেয়। গলায় আঠার মতো কী যেন আটকে থাকে। ফারিহা ঢোক গিলতে পারে না।

তিনতলা একটা বাড়িতে ভাড়া থাকে ফারিহারা।

ক্যাম্পাসে মেয়েদের জন্য একটা মাত্র ছাত্রীনিবাস—ফয়জুন্নেসা হল। কলেজে ছাত্রীসংখ্যা যেখানে কম করে হলেও ১০ হাজার, তার ভেতর হলে থাকার সুযোগ পায় মাত্র শ পাঁচেক। বাকি সবাই থাকে কলেজের বাইরে, কয়েকজন মিলে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে। ফারিহাদের মেসে ওরকম ছয় বান্ধবী একসাথে থাকে ওরা।

আজ পৌষের ১০ তারিখ। শীতের শুরু বলা যায়। শহরের উত্তর দিক থেকে হিমেল হাওয়া বইছে। মনে হচ্ছে এবার ভালো শীত পড়বে। একবার সন্ধ্যা পড়লে হিম বাতাসের তোড়ে আর বাইরে থাকা যায় না। ঠান্ডায় হাত-পা জমে আসে। ফারিহা টিউশনি শেষ করে যখন মেসে ফিরল, ততক্ষণে দূরের কয়েকটি মসজিদে মাগরিবের আযান পড়েছে। বাকিদের ফেরার নাম নেই। কখন ফিরবে তা অনুমান করা শক্ত।

ওরা যতক্ষণে মেসে ফিরল তখন ঘড়ির কাঁটায় ৯টা ২৫। এরকম ভর শীতে এতক্ষণ বাইরে থাকে কেউ? বিড়বিড় করতে করতে দরজা খুলল ফারিহা।

একেকজনের হাতে চার-পাঁচটা করে শপিং ব্যাগ। কেনাকাটা করতেই বাইরে গিয়েছিল ওরা। ফ্রেশ হয়ে নিল সবাই। রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষে গোল হয়ে খাটে বসল বান্ধবীরা। শপিংয়ের প্রদর্শনী হবে। ফারিহাকেও টেনে বসানো হলো খাটে। ওর কাজ কার ড্রেস কেমন

হয়েছে বিচার করা। একটার পর একটা ব্যাগ খোলা হচ্ছে।

ওদের শপিংয়ের ফিরিস্তি অনেকটা এমন : প্রত্যেকে দুটো করে শীতের জ্যাকেট কিনেছে। একটা লং জ্যাকেট, অন্যটা শর্ট। শর্ট জ্যাকেটটা জিন্সের। আর লং যেটা ওটা লেদারের। কত রকমের কসমেটিক্স যে কিনেছে, তার তালিকা করা কঠিন। কম করে হলেও তিন রকমের স্কিন কেয়ার ক্রিম। আরও নিয়েছে কয়েক রকমের লিপবাম আর লিপ-অয়েল। শীতের আবহাওয়ার সাথে মিলিয়ে কিনেছে স্মোকি পারফিউম।

ফারিহা ওসব দেখে দেখে অভ্যস্ত। দু সপ্তাহ না ঘুরতেই ওরা শপিংয়ে যায়। মাঝে মাঝে ফারিহার মনে হয়, আল্লাহ যেন ওদেরকে শপিং করতেই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এদের মাঝে দুজনের বাড়ি ফারিহাদের গ্রামেই। খুবই সাধারণ পরিবারের মেয়ে। একজনের বাবা ছোটখাটো ঠিকাদারির ব্যবসা করেন। মাসশেষে হয়তো হাজার ত্রিশেক টাকা রোজগার হয়। আর অন্যজনের বাবার পোল্ট্রির ফার্ম। গেল মৌসুমে কী একটা ভাইরাস রোগে অনেকগুলো মুরগি মারা পড়েছে। তখন থেকেই ব্যবসা পড়তির দিকে। অথচ ওরাই কিনা শীত কাটাবার জন্য একেকজন হাজার দশেক টাকার শপিং করে ফেলল! ফারিহা অবাক হয়। বাড়িতে অনেকের বাবা-মায়ের নুন

আনতে পান্তা ফুরোয়। কতটা কষ্টেসৃষ্টে সংসারের ঘানি টানেন বাবারা। অথচ এখানে ওরা বাহারি ফ্যাশনের দোকান সাজিয়ে বসে।

ফারিহার ভাবনায় ছেদ পড়ে। মৌরি ওর সামনে একটা মেরুন কালারের টপস মেলে ধরেছে। ঝুলটা টি-শার্টের চেয়ে সামান্য একটু বেশি হবে। পরলে হাঁটুর কমসে-কম ছ ইঞ্চি ওপরে থাকবে। মৌরি বলল, 'বল না এটা কেমন হয়েছে?' ফারিহা তাকিয়ে দেখে চারজনই একটা করে টপস কিনেছে ভিন্ন ভিন্ন রঙের। সাথে আঁটোসাঁটো জিন্স-প্যান্ট। ওগুলো কার জন্য কিনেছে ওরা? কখনো তো টপস আর জিন্স পরতে দেখিনি ওদের। থ্রি-পিস ছাড়া অন্য কোনো ড্রেস পরেছে বলে মনে পড়ে না। মাঝে মাঝে অনুষ্ঠান বা পার্টিতে হয়তো শাড়ি পরতে দেখা গেছে দুয়েকবার।

ফারিহা জিজ্ঞেস করল,

: এগুলো কার জন্য কিনেছিস তোরা?

চারজন প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল,

: আগে বল কেমন হয়েছে?

ফারিহা উদাস ভঙ্গিতে উত্তর দেয়,

: খারাপ না। এখন বল কার জন্য কিনেছিস ওসব?

: কার জন্য কিনব আবার? শপিংয়ে গিয়েছি আমরা, আর কেনাকাটা করব বুঝি অন্য কারও জন্য?

ফারিহা বুঝতে পারে ওদের মাথায় ভূত চেপেছে। অধঃপতনের শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ওরা। মৌরি মেয়েটাই একটা সময় অন্যরকম ছিল। কলেজে প্রথম প্রথম বোরকা-নিকাব পরে ক্লাসে আসত। সব সময় মেয়েদের সারিতে বসত। একান্ত দরকার ছাড়া কোনো ছেলের সাথে কথা বলেছে, গোটা ফার্স্ট ইয়ারে এমন কখনো হয়নি। তারপর ধীরে ধীরে সব কেমন যেন বদলে গেল। প্রথমে নিকাব ছাড়ল, তারপর বোরকা, তারপর ধরল থ্রি-পিস। আর এখন তো টপস আর জিন্স-প্যান্ট ধরার প্ল্যান করেছে।

ওদের গায়ে আসলে ক্যাম্পাসের হাওয়া লেগেছে। এই হাওয়া আসে চতুর্দিক থেকে। আমাদের ইংরেজি বিভাগের কথাই বলা যাক। ওই যে রুবাইদা ম্যাডাম আছেন না একজন? মানুষটা কেমন ক্ষ্যাপাটে ধরনের। একটা বিষয়ে তার ভীষণ অ্যালার্জি। বোরকা-পরা মেয়েদের তিনি দু চোক্ষে দেখতে পারেন না। ক্লাসে কোনো মেয়েকে বোরকা-পরা দেখলে তার মেজাজ বিগড়ে যায়। মাঝে মাঝে দুয়েকজনকে ক্লাস থেকে বেরও করে দিয়েছেন। ভাইভা বোর্ডে নিকাব খুলতে না-চাওয়ায় ডবল জিরো দেওয়ার ইতিহাসও আছে। তার

কথা—'তোমরা ভার্সিটি লেভেলে পড়াশোনা করো, কিন্তু বেশভূষা এ রকম কেন? বোরকা পরে এ যুগে কেউ ক্লাসে আসে? ইউনিভার্সিটি তো আর ধর্ম পালনের জায়গা না। মুখ-কান ওরকম ঢেকে রাখলে টিচারদের কথাও তো ভালো করে শোনা যায় না। ওদেরকে দেখো (যারা গতর উদোম করে আসে), কত ভালো লাগে। জিন্স-টপস বা থ্রি-পিস তো একেবারে ফেলনা ড্রেস না। পরলে দোষ কোথায়?'

আরেকজন আছেন। নাহিদ স্যার। তিনি ক্লাসে ঢুকেই সবার আগে ছেলে-মেয়ে বাঁটেন। মানে, ছাত্র-ছাত্রীদের বলেন সারি ভেঙে একসাথে বসতে। ছেলে-মেয়ে এক বেঞ্চে না বসলে তার কাছে নাকি ভালো লাগে না। প্রাইমারির ক্লাসরুম মনে হয়। তিনিও মাঝে মাঝে বোরকা-পরা মেয়েদের অযথাই হেনস্থা করেন। 'এই মেয়ে, তোমার কি বাড়িতে বাপ-ভাই নাই? তুমি কি বাপের সামনেও মুখে ত্যানা ঝুলিয়ে রাখো? শিক্ষক তো বাপের মতোই। তাহলে শিক্ষকের সামনে মুখ খুলে রাখতে চুলকায় ক্যান?'

স্যার-ম্যাডামদের ওসব তালিম শুনে শুনে একসময় মেয়েগুলোর মন পালটে যায়। তা ছাড়া মনে আধুনিকতার হাওয়া লাগলে তখন আর লাজ-লজ্জার বাঁধ থাকে না। অন্যের মুখে 'স্মার্ট' শোনাটা এ যুগের মেয়েদের বলা যায়

এক রকমের প্রধান চাওয়া। মডার্ন পোশাক না পরলে নিজেকে কেমন যেন দলছুট দলছুট মনে হয়। অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয় কাজ করে। এসব ভেবেই ফারিহার মেসের চার বান্ধবী জিন্স-টপস কিনে এনেছে।

মৌরির ছোট বোন এসেছে আজ। ওর নাম রূপা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে পড়ে। সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে, তাই বোনের কাছে বেড়াতে এসেছে। রূপা এর আগে কখনো কুমিল্লা আসেনি। প্রথমত কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ দেখবে। এর বাইরেও ময়নামতি, লালমাই পাহাড়, শালবন বিহার ঘুরে দেখবে।

রাতের খাওয়াদাওয়ার ঝামেলা শেষ। এবার গল্প-আড্ডা দেওয়ার পালা। সবাই বসল গোল হয়ে। রূপা, মৌরি, তানিশা এবং অন্যরা। ফারিহাকেও বসানো হলো জোর করে। আলাপের দাঁড় বাওয়ার দায়িত্ব পড়েছে রূপার কাঁধে। রূপা কথা বলায় সরেস।

ওদের আলাপের কোনো দিক-বেদিক নেই।

কোথা থেকে শুরু, আর কোথায় গিয়ে শেষ—তা কেউ জানে না। এর ভেতরে রূপার কাছে একটা ব্যাপার নিয়ে জানতে চাইল ফারিহা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগেরই এক শিক্ষক তার ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছে। এ নিয়ে তো সারাদেশ তোলপাড়। ঘটনাটা আসলে কী?

রূপা ওই ঘটনার সবটাই জানে। এটা ওর ডিপার্টমেন্টের ঘটনা। তা ছাড়া ভুক্তভোগী মেয়েটি ওর পরিচিত সিনিয়র আপু। বেশ ভালো সম্পর্কও তার সাথে। ওই আপুর কাছ থেকে যা যা শুনেছে, রূপা হুবহু তা-ই বলল—

'আমাদের ড. মাহাবুবুল মতিন স্যার। আমি তার তত্ত্বাবধানে জৈব রসায়নের ওপরে একটা থিসিস করছিলাম। থিসিস চলাকালীন তিনি বেশ কয়েকবার আমাকে যৌন-নিপীড়ন করেন। যেমন : মাঝে মাঝে জোর করে হাত চেপে ধরা, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় অতর্কিত ও জোর করে স্পর্শ করা, অত্যন্ত অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করা। এ ছাড়া গবেষণার জন্য কেমিক্যাল দেবার কথা বলে নানান বাহানায় তিনি আমাকে জোর করে রুমে ডেকে নিতেন। তারপর জাপটে ধরতেন।

৬ জানুয়ারি, আনুমানিক সকাল ১০টা। আমি তখন ল্যাবে বসে কাজ করছিলাম। বলা নেই কওয়া নেই তিনি

চুপেচাপে ল্যাবে ঢোকেন। এরপর তার খুব শীত লাগছে, এ কথা বলে আমাকে আচমকা জড়িয়ে ধরেন। প্রথমটায় আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাই। তবে দ্রুতই নিজেকে সামলে নিই। তারপর তাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিই। ওই মুহূর্তে আমার ল্যাবমেটরা দৌড়ে ছুটে আসে। সে-যাত্রায় আমি কোনোরকম বেঁচে যাই। এ ঘটনার জের ধরে আমি ও ল্যাবের অন্য মেয়েরা একাকী ল্যাবে না-যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।

এরপর ১৩ জানুয়ারি দুপুর নাগাদ তিনি আমাকে আবার ডাকেন তার রুমে। এবারও সেই কেমিক্যাল দেবার বাহানা। যাহোক, যে-ই আমি ফ্রিজ থেকে কেমিক্যাল বের করতে গিয়েছি, অমনি তিনি আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেন। আমি তাকে ধাক্কা মেরে রুম থেকে বের হবার চেষ্টা করি। কিন্তু তিনি বল খাটিয়ে দরজা ভেতর থেকে লক করে দেন। এরপর তার হাত ও মুখ দিয়ে আমার শরীরের নানান অংশ ছুঁয়ে উত্তেজনা তৈরি করার চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে তার সাথে আমার ভীষণ ধস্তাধস্তি হয়। আমি আত্মরক্ষা করে পালিয়ে বাঁচি। আমি সাথে সাথে বিষয়টা ল্যাবের বাকি দুজন মেয়েকে জানাই। তারাও এমন আচরণের শিকার হয়েছে বলে আমাকে জানায়। পরবর্তীতে মতিন স্যার আমাকে ও ল্যাবে-থাকা দুই মেয়েকে তার রুমে ডেকে নিয়ে বিভিন্নভাবে হুমকি দেন। আমরা যাতে বিষয়টা নিয়ে

মুখ না খুলি সেজন্য প্রায় আধাঘণ্টা তার রুমে আটকে রাখেন।'[২৮]

পরবর্তীতে ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের সামনে ঘটনার তদন্ত করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। তদন্তে ওই আপুর অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। সিন্ডিকেট সভায় ওই শিক্ষককে স্থায়ীভাবে অপসারণ করা হয়।[২৯]

এর মাঝে মৌরি বলল, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকও তো অনেকটা একই কাণ্ড ঘটিয়েছে। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক। সবচেয়ে ভয়াবহ যে ব্যাপারটি বেরিয়ে এসেছে তা হলো, ওই দরবেশ সিসি ক্যামেরা দিয়ে ছাত্রীদের প্রায়ই দেখত। জুম করে করে দেখত। যেসব ছাত্রী একটু খোলামেলা পোশাক পরত, ক্যামেরায় তার ফোকাস সেসব ছাত্রীদের দিকেই বেশি থাকত।'[৩০]

রূপার লম্বা ঘটনা শোনানোর পর মৌরির এই কথাটা আরেকটু নাটকীয়তা এনে দিয়েছে। সবাই কমবেশি ঘাবড়ে গেছে। তবে ফারিহা কেন রূপার কাছে এসব জানতে চেয়েছিল, তখনো কেউ তা টের পায়নি। রহস্যটা ফাঁস করে দেবার এটাই উপযুক্ত সময়। ফারিহা এবার কথার সুতোটা তার কাছে টেনে নিল। বলল,

মৌরি, তোরা যে গতকাল জিন্স আর টপস কিনে

আনলি পরার জন্য, তার সাথে কিন্তু আজকের ঘটনার একটা দারুণ মিল আছে। দেখ, স্যার কেন ক্লাসে এসে বারবার আমাদেরকে ছোট ড্রেস পরতে বলেন, কখনো ভেবেছিস এটা নিয়ে? আমরা বোরকা পরলেই কী, মডার্ন ড্রেস পরলেই কী, তাতে স্যারের তো নাক গলানোর কথা না। তার কাজ পড়ানো। আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি কেন বাঁ হাত ঢোকাবেন? আসল কথা হলো, তিনিও আমাদেরকে চেয়ে চেয়ে দেখেন। শুনতে হয়তো খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু ঝড় দেখে উটপাখির মতো বালুতে মুখ গুঁজে থাকাটা কাজের কথা নয়। বুদ্ধিমান মানুষ সত্যটা মেনে নিতে গড়িমসি করে না। সে গুরু নাকি স্যার, তা দেখার বিষয় নয়। বিশ্বাস নাহলে ওই দুটো ঘটনায় নিউজের নিচে যেসব কমেন্ট জমা পড়েছে, ওগুলো একটু পড়ে আয়। এমন শত শত কমেন্ট পাওয়া যাবে যেখানে ছাত্রীরা লিখেছে—'আমাদের কলেজেও অমন ঘটনা ঘটেছে বহুবার'।

নিজের চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো ভাইয়ের ব্যাপারেও ইসলাম আমাদের সাবধান থাকতে বলেছে। তাদের সামনেও নিজের ইজ্জত-আব্রু বাঁচিয়ে চলতে হবে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কোন ছার! সে আমার কবেকার কোন আত্মীয়? শিক্ষক যদি বাবা-ই হবে, তাহলে রসায়নের থিসিস-করা ওই আপুটার অমন সর্বনাশ কেন করল? আর দরবেশই-বা কেন ছাত্রীদের

ছবি দেখবে লুকিয়ে লুকিয়ে?

ফারিহার কথাগুলো ওদের চোখ খুলে দেয়। গা গুলিয়ে আসে। ছিঃ! এমন চরিত্রহীন 'শিক্ষক'দের চোখে মডার্ন সাজবার জন্যই নিজেদের বেশভূষা পালটে ফেলছি? তাদেরকে দেখাবার জন্যই বোরকা ছেড়ে শর্ট ড্রেস ধরছি? নিজের ওপর রাগ ওঠে মৌরির। কান দিয়ে যেন ধোঁয়া বের হচ্ছে। বাকিদেরও একই অবস্থা।

তানিশা একটু জেদি টাইপের মেয়ে। আচমকা উঠে দাঁড়ায়। প্লাস্টিকের ওয়্যারড্রোব খুলে গতকালের শপিং ব্যাগগুলো হাতে নেয়। তারপর সোজা রান্না ঘরে। ওর হাতে দেশলাই বক্স। তানিশা কোন কাণ্ড ঘটাবে কে জানে! ও সবার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ছাদে। ঘন কুয়াশায় সমস্ত তল্লাট ঢাকা পড়েছে। ছাদটাকে মনে হচ্ছে মাঝসমুদ্রে ভাসতে থাকা একটা জাহাজের ডেক। কাপড়গুলো জড়ো করা হয় একসাথে। তাতে যোগ দেয় বাকিরাও। দেশলাই কাঠির এক খোঁচায় পুরো ছাদটা যেন জ্বলে উঠল।

জিন্স আর টপসগুলো পুড়ছে দাউদাউ আগুনে। কিন্তু ফারিহারা দেখছে ভিন্ন কিছু। পুড়ছে লোলুপ একেকটা চোখ। ওরা ঘাপটি মেরে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক লাউঞ্জে। ওরা হায়েনার মতো চোখ পাকায় ক্লাসে, ল্যাবে, গোটা ক্যাম্পাসে।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙল ফারিহার। বাইরে তখনো আলো ফোটেনি। ভীষণ কুয়াশা পড়েছে। ফজরের নামাজ পড়ে কুরআন হাতে নিয়ে বসল। আধাঘণ্টা কুরআন পড়বে। প্রতিদিন পাঁচ আয়াত করে পড়ে। সাথে আয়াতগুলোর অনুবাদও দেখে নেয়। কুরআন-পড়া শেষে রান্না বসাবে। রান্না বলতে—হয়তো একটু ভাজি, আর আটা ছেনে দুটো পরোটা। শীতকালে একটা জিনিস ওর খুব ভালো লাগে। বাজারে তরি-তরকারির অভাব থাকে না। লাউ, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শিম, ব্রোকলি, টমেটো—ভাজি করবার জন্য রকমারি সবজি পাওয়া যায়।

শুক্রবারটা ওর অন্যরকম কাটে। পুরো সপ্তাহ ধরে অধীর অপেক্ষায় থাকে এ দিনটার জন্য। শহর থেকে মোটামুটি ১০ কিলোমিটার দূরে আমড়াতলা ইউনিয়ন। ওখানে পথশিশুদের জন্য একটা স্কুল আছে। নাম 'ভোরের পাঠশালা'। ফারিহা ওখানে বিনে-পয়সায় শিশুদের পড়ায়। সকাল আটটায় বের হয়। দুপুর ২টা পর্যন্ত শিশুদের সাথেই কাটায়।

আজও ফারিহা রুটিন-মাফিক বেরিয়ে পড়ল। যাতায়াতের মাধ্যম রিক্সা। ভোরের অন্ধকারে কুয়াশা যতটা বেশি মনে হয়েছে, এখন তেমন মনে হচ্ছে না। ঝকঝকে রোদ উঠেছে। কুয়াশা আর রোদের মিশেলে শহরটা কেমন টকটকে কমলা রং ধারণ করেছে। শীতের শুকনো বাতাস এসে গায়ে লাগছে। ভালো লাগে ফারিহার। মনটা কেমন ফুরফুরে হয়ে যায়।

'ভোরের পাঠশালা'-তে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কাগজে-কলমে ৫২ জন। গড়পড়তায় চল্লিশজন উপস্থিত থাকে। উপস্থিতির সংখ্যাটা খারাপ নয়। সপ্তাহে একদিন ক্লাস বলেই কিনা, ছন্নছাড়া ছেলে-মেয়েগুলোও আড়মোড়া ভেঙে সকাল সকাল ক্লাসে হাজির হয়। 'ভোরের পাঠশালা'য় শিক্ষিকা একজনই—ফারিহা। একাকী ক্লাস নেওয়াটা ফারিহার জন্য আনন্দের। ব্যাপারটা সে দারুণ উপভোগ করে। কারণ—শিশুদেরকে নিজের মতো করে গুছিয়ে নেওয়া যায়। 'ভোরের পাঠশালা'র ক্লাসরুমে ঢুঁ মারলে ভিন্ন কিছু ব্যাপার চোখে পড়বে। অন্য আট-দশটা স্কুলের তুলনায় 'ভোরের পাঠশালা' এখানেই ব্যতিক্রম।

ক্লাসটা দুটো সারিতে ভাগ করা। একদিকের সারিতে ছেলেরা বসে, অন্য সারিতে মেয়েরা। বিনা প্রয়োজনে ছেলে-মেয়েদের ভেতরে কথা চালাচালি

পুরোপুরি নিষেধ। ওদের বয়স আর কতই-বা হবে? ৬ থেকে ১২ বছরের ভেতরে। তবুও এ ব্যাপারে কোনো ছাড় দিতে রাজি নন ফারিহা ম্যাডাম। ছাত্র-ছাত্রীরা অবশ্য ফারিহাকে আপা বলে ডাকে। আপা ডাকটাই ওর কাছে ভালো লাগে। পোশাকের ব্যাপারেও কোনো আপস নয়। একটা বাচ্চা মেয়েও ছেলেদের গেঞ্জি পরে ক্লাসে ঢুকতে পারে না। ফারিহার কথা একটাই, আমার ছাত্র-ছাত্রীরা হবে পুরুষের মতো পুরুষ, আর নারীর মতো নারী। নারী আর পুরুষ মিলিয়ে কোনো জগাখিচুড়ি হওয়া যাবে না।

আরেকটা ব্যাপারেও ফারিহা সিরিয়াস। ও সব সময় স্টুডেন্টদের 'ছাত্র-ছাত্রীরা' বলে সম্বোধন করে। 'শিক্ষার্থীরা' বলে না। কারণ, ও খেয়াল করেছে, নারীবাদীরা খুব জোরেশোরে একটা কাজ করছে—নারী আর পুরুষের পরিচয়কে এক করে ফেলছে। 'শিক্ষিকা' এখন আর বলে না। পুরুষ-নারী উভয়কেই শিক্ষক বলে। এমনকি 'আদমশুমারি' নামটাও বদলে দিয়েছে। এখন বলে 'জনশুমারি'। অথচ 'আদমশুমারি' শব্দটা শুনতে কত ভালো লাগে। আদম পুরুষের নাম, এ কারণেই নাকি বদলে দিয়ে জনশুমারি করা।

আচ্ছা বলুন তো, দাদা আর দাদিকেও যদি এক করে ফেলা হয়, কেমন হবে তখন? দাদাকেও দাদা

বলল, দাদিকেও দাদা বলল। এতে পরিচয়টা নষ্ট হবে কিনা? 'তোমার দাদা পান চেয়েছে।' এখন ছেলেটা কার কাছে পান নিয়ে যাবে? এ জন্যই নারী-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় থাকা দরকার। দুনিয়ার সব ভাষাতেই এ পার্থক্যটা আছে।

আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। জগ, কাপ আর গ্লাস। তিনটা আলাদা জিনিস, আলাদা নাম। চিনতে সুবিধা হওয়ার জন্যই আলাদা আলাদা নাম দেওয়া। কই, এতে তো কারও কোনো সমস্যা হচ্ছে না। এখন কেউ যদি বলে, না, কাপ বেচারা ছোট, ওকে দুর্বল দেখে কাপ বলবেন, তা হবে না। এ অধিকার আপনাদের নেই। এখন থেকে কাপকেও জগ বলতে হবে। গ্লাসকেও জগ বলতে হবে। কেমন হবে ব্যাপারটা তখন? আপনি দোকানে গেলেন কাপ কিনতে। এখন কাপকে যেহেতু কাপ বলা যাবে না, তাই বললেন আমাকে কয়েকটা জগ দেখান। দোকানদার বেচারা আপনাকে কী দেখাবে বলুন? সে তো মুশকিলে পড়ে যাবে। জগ দেখাবে, নাকি কাপ দেখাবে? নাকি গ্লাস দেখাবে? সে তো হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। নারীবাদীদের এই খেলাটা ফারিহার কাছে হাস্যকর আর বিদঘুটে মনে হয়। দেখেন একটা সহজ বিষয়কে কেমন কঠিন করে ফেলা হলো। ফারিহা চায় না তার ছাত্র-ছাত্রীরাও এরকম মুশকিলে পড়ুক।

নতুন বছর শুরু হয়েছে মাস পেরুল। অথচ পাঠ্যপুস্তক হাতে এসে পৌঁছেছে গতকাল। উপজেলা শিক্ষা অধিদপ্তর মারফত ৫০ সেট বই এসেছে। নতুন পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বিতর্ক ফারিহার চোখ এড়ায়নি। তা ছাড়া, একটা গবেষণার কাজে বইগুলো ভালো করে পড়তে হয়েছে ফারিহাকে। 'ভোরের পাঠশালা'য় কোমলমতি শিশুদের ওই বই দিয়ে পাঠ দেবে কি না, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

ফারিহা গবেষণা করতে গিয়ে একটা ভয়ংকর জিনিস উদ্‌ঘাটন করেছে। পাঠ্যপুস্তক রচনার পুরো রোডম্যাপটা ধার করা হয়েছে পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকে। আমাদের জানা থাকবার কথা, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ১৭টা পয়েন্ট আছে। এর ভেতরে ৪ নম্বর পয়েন্ট হলো : মান-সম্মত শিক্ষা। আর ৫ নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে জেন্ডার সমতার কথা। এখন, জাতিসংঘের মাপকাঠিতে যদি বাংলাদেশকে ভালো করতে হয়, তাহলে শিক্ষাব্যবস্থাটাও জাতিসংঘের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে হবে। ওটা না করা হলে সেই শিক্ষা আর 'মানসম্মত' হবে না। এবারের পাঠ্যপুস্তকে ঠিক এই কাজটাই খুব চালাকির সাথে করা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তক রচনা বিরাট এক লাভজনক কারবার। না হয় এরকম দু বছর পর পর কারিকুলাম বদলাবার কথা নয়। এই লাভের খতিয়ান নিয়ে দুটো কথা না বললেই নয়। নতুন করে কারিকুলাম প্রণয়ন করতে গিয়ে শুরুতেই যে কাজটা করা হয় তা হলো, সারা দেশ থেকে শ খানেক শিক্ষাবিদের তালিকা করা হয়। ওই তালিকায় বেশিরভাগই থাকে জাফর ইকবাল-মার্কা লোকজন। বুঝতেই পারছেন তাহলে কী চমৎকার চমৎকার শিক্ষাবিদ এরা।

তারপর এদেরকে ভিসা-পাসপোর্ট দিয়ে ইউরোপে পাঠানো হয়। অ্যামেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স—এসব দেশে। মনে করেন পুরো ফ্যামিলিসহ একরকম আনন্দ-ভ্রমণ আরকি। ওসব দেশে তারা মাস তিনেক থাকেন। ঘুরে ঘুরে স্কুলগুলো দেখেন। কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক বগলদাবা করে অ্যাপার্টমেন্টে ফেরেন। তার আগে মদের বারেও একটু ঢুঁ মারতে ভোলেন না। তারপর রাতভর বসে বসে ওসব বইয়ের যাবতীয় জিনিসপাতি হজম করেন। জাফর ইকবাল স্যারেরা একপর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে বলেন—ইয়েস ইয়েস! এটাই তো খুঁজছিলাম। একদম এই জিনিসই।

এভাবেই তিন মাস কেটে যায়। শিক্ষাবিদদের ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে আসে। এবার বিমান ধরার পালা।

আসার আগের দিন তারা জম্পেশ একটা শপিং করেন। পারলে গোটা ইউরোপের বাজারটা মাথায় করে দেশে নিয়ে আসেন, এরকম অবস্থা আরকি।

দেশে এসে তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে ঢাউস সাইজের একটা প্রতিবেদন দাখিল করেন। মনে করেন প্রায় হাজার দুয়েক পৃষ্ঠার একটা বই। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এই প্রতিবেদন দেখে বেজায় খুশি হয়। ভাবে, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এখন অনুদান না দিয়ে যাবে কোথায়? এবার এই প্রতিবেদন কাটা-ছেঁড়া করে পাঠানো হবে ইউনেস্কো, ইউএনডিপি, ইউনিসেফের মতো জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার কাছে। কেন পাঠানো হবে? মাল-পানি লাগবে তো। মানে, কারিকুলাম প্রণয়ন করার জন্য অর্থায়ন করবে ওসব সংস্থা।

কিন্তু তারা তো আর এমনি এমনি টাকা দেবে না। তাদেরকে খুশি করতে হবে। সংক্ষিপ্ত যে প্রতিবেদন পাঠানো হবে, ওটা তাদের মনমতো হতে হবে। আর কাউকে খুশি করার বেলায় বাঙালি তো ওস্তাদ। এসব মাথায় রেখে প্রতিবেদনে লেখা হবে—দেশের সেরা সেরা শিক্ষাবিদদের নিয়ে আমরা একটা কমিটি গঠন করিয়াছি। উহারা আপনাদের দেশের স্কুলগুলো ঘুরিয়া দেখিয়াছেন। আপনাদের কারিকুলামে আমাদের জন্য খুবই চমৎকার উদাহরণ রহিয়াছে। শিশুকাল হইতে

বাচ্চাদের যৌনশিক্ষা দিয়া আপনারা দারুণ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহা ছাড়াও বাচ্চাদের আপনারা জেন্ডার থিওরির পাঠ দিতেছেন। আমরাও উহার সবকিছু হুবহু নকল করিয়াছি। বরং আপনাদের চেয়ে আমরা একধাপ আগাইয়া মনস্থির করিয়াছি—নতুন কারিকুলামের সবগুলো বই লেখা হইবে জেন্ডার থিওরির চোখে। ইহা হইতে বাদ যাইবে না ফিজিক্স, বায়োলজি এমনকি ম্যাথ বইও। বই লেখা হইবে নারীবাদীরা যেইভাবে কমান্ড করিবে, ঠিক ওইরূপে। আপনাদের সিদ্ধান্ত শিরোধার্য।

এই প্রতিবেদন দেখে জাতিসংঘ খুশি হয়। কারিকুলাম প্রণয়ন করবার জন্য ডলার পাঠায়। ২০২৩ সনের ২৩ সেপ্টেম্বরের খবর। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে ৩০০ মিলিয়ন ডলার অনুদান পাঠিয়েছে।[৩১] সংকটের মাঝেও ওরকম গরম গরম ডলার আসে কয়েক কিস্তিতে। ভালোই তো।

এবার পাঠ্যপুস্তক রচনা করবার পালা। বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাঁধে পড়বে এ দায়িত্ব। তবে শর্ত হলো, তাদেরকে কিছুটা বামপন্থী ও নারীবাদ-ঘেঁষা হতে হবে। বাম-নারীবাদী আর দিদি-পিসিদের মিশ্রণে তৈরি হয় দারুণ এক কম্বিনেশন। তারপর একদিন প্রেস ঘুরে আমাদের বাচ্চাদের হাতে আসে নতুন বছরের বই। আহা কী সুন্দর ঘ্রাণ। নতুন বই

শুঁকতে মজাই আলাদা। কিন্তু পৃষ্ঠা ওলটাতেই দেখা গেল শরীফ আর শরীফার গল্প। আর ওই অ-খুশি আপা আছেন না একজন, ওইটা তো শয়তান জন মানির বাংলাদেশি ভার্সন। অ-খুশি আপার কাজই হলো, ছেলে আর মেয়েকে শুধু এক বেঞ্চে বসিয়ে দেওয়া। অ্যাসাইনমেন্টের নাম করে দুটো ছেলে-মেয়েকে বাড়িতে নির্জন রুমে ঢুকিয়ে দেওয়া। ও হ্যাঁ, আরেকটা কাজে তিনি ওস্তাদ। কেমনে ছেলে-মেয়েদেরকে ফুটবল দিয়ে একসাথে খেলতে নামিয়ে দেওয়া যায়। পড়াশোনা গোল্লায় যাক। আগে খেলতে দিন।

সব তো হলো। এবার টাকার ভাগ-বাটোয়ারা কীভাবে হবে? শুরুতে শিক্ষাবিদদের নিয়ে যে কমিটি করা হয়েছে, তারা পাবে এক ভাগ। মনে করেন একেক জনের ঝুলিতে লাখ পঞ্চাশেক জমা পড়ে আরকি। তারপর বইগুলো যারা লিখল এত খাটুনি করে, তাদেরকে ঠকানো হবে কেন? একেকটা বইয়ে তপু আর তুলি, নীরা আর অতুল, শরীফ আর শরীফা—এরকম করে কতগুলো টুটাফাঁটা গল্প ফাঁদতে হয়েছে। ওগুলো লেখা কি চাট্টিখানি কথা? গঙ্গা নদীর পাড়ে বসে, ঝিরিঝিরি হাওয়ায়, কত জ্ঞান-গুগলিং করে লিখতে হয়েছে একেকটা গল্প। তাই তাদের পকেটেও ভালো পরিমাণে সম্মানি জমা পড়ে। টাকার অঙ্কটা নাহয় গোপনই থাকল।

'ফারিহা আপা!'—এক ছাত্রের এরকম ডাকে ফারিহার কল্পনায় ছেদ পড়ে। ধুর, ছাইপাঁশ কী ভাবছি ওসব।

যাহোক, ফারিহা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ওসব জিনিস সে তার স্কুলে পড়াবে না। তারচেয়ে ধর্মসাগরের ফুটপাতে, কলেজের সামনে অথবা চলন্ত বাসে হকাররা বাচ্চাদের জন্য যেসব বই বেচে—ওগুলো ঢের ভালো। নিজের টাকায় ওগুলোই পঞ্চাশ সেট কিনে এনে বাচ্চাদের পড়াবে।

ঘড়ির কাঁটায় ১টা ৫৫ বাজে। ছুটির ঘণ্টা পড়বে। সকালে আসার সময় বাচ্চাদের জন্য পোলাও রান্না করে এনেছে ফারিহা। ৪০টা প্যাকেট একটা বড় বাজারের ব্যাগে ঢোকানো। ফারিহা প্রত্যেকের হাতে একটা করে প্যাকেট দেয়। শিশুদের আনন্দ আর দেখে কে। পথশিশুদের যেখানে দুমুঠো ভাত জোটে না ঠিকঠাক, সেখানে স্কুল ছুটির সাথে ওরকম এক প্যাকেট পোলাও, ওদের কাছে আকাশের চাঁদ পাওয়ার মতোই।

একটা খালি রিক্সায় চেপে বসে ফারিহা।

টুং করে শব্দ পড়ল ম্যাসেঞ্জারে। পরের দুটো ক্লাস হবে না আজ। চার নম্বর ক্লাসটা বিকেল তিনটায়। হাতঘড়িতে তাকাল ফারিহা। কাঁটায় কাঁটায় দশটা বাজে। তার মানে আরও পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে পরের ক্লাসের জন্য। সময়টা কীভাবে কাটানো যায় তা-ই ভাবছে ফারিহা। কলেজ থেকে বেরিয়ে দু কদম হেঁটে ফারিহা এল রানির দীঘির পাড়ে। আজও এখানটা বেশ ফাঁকা লাগছে। এই সময়টা ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসে ব্যস্ত থাকে।

বট গাছের গুঁড়িতে বসল ফারিহা। রানির দীঘির পাড়ে এই একটাই বটগাছ। গাছটার বয়স হবে কম করে হলেও দেড়শ বছর। খুবই প্রাচীন। গাছের শেকড়গুলো বিরাট বিরাট। ওরকম একটা শেকড়েই বসে আছে ফারিহা।

মাথার ওপরে আকাশ। নীল-রঙা আকাশ। সেখানে মেঘ উড়ছে। মেঘের ছায়া পড়েছে দীঘির জলে। দীঘির ওপারে খেজুর গাছ। বাবুইয়ের বাসার মতো একটা

রসের হাঁড়ি ঝুলছে তাতে। হঠাৎই এক ঝাঁক সাদা বক উড়ে গেল। রোদে চিকচিক করছে ডানাগুলো। ফারিহা আনমনে বলল—আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সুনিপুণ কারিগর। কত সুন্দর করে তিনি সাজিয়েছেন সব কিছু!

ফারিহা ভাবনায় হারিয়ে যায়। সত্যিই! চমৎকার মহান রবের সৃষ্টি। তিনি সবকিছু বানিয়েছেন জোড়ায় জোড়ায়। কেবল মানুষ নয়। বনের বাঁকে বাঁকে, খাল বা নদীর ধারে দল বেঁধে ছুটে-চলা হরিণ, ঢেউয়ের তালে দুলতে থাকা শালুক, কিংবা মাচার ওপরে হাসতে থাকা ডগডগে লাউ-ফুল—সবই তিনি বানিয়েছেন জোড়ায় জোড়ায়। পুরুষ হরিণ, নারী হরিণ। পুরুষ ফুল, নারী ফুল। মানুষও তা-ই। পুরুষ অথবা নারী। সবকিছু জোড়া করে বানানোর কারণ—তারা যেন একে-অপরের কাছ থেকে আদর-ভালোবাসা পেতে পারে। সুখ-দুখ দুজনে ভাগাভাগি করে নিতে পারে।

সারা দিন কাজ করে স্বামী যখন বাড়ি ফিরবে, স্ত্রীর মুখ দেখে তার চোখ জুড়াবে। স্বামীকে দেখেও স্ত্রীর মন জুড়াবে। একসময় ঘর আলো করে শিশু-সন্তান আসবে। জগৎ-জোড়া মায়া তার চোখে। এভাবেই স্বামী-স্ত্রীর সব সুখ পূর্ণতা পায়।

শিশুটির ঠাঁই হয় মায়ের নরম বুকে। মায়ের গড়নই

এমন। শিশুকে লালন-পালনের উপযোগী করেই মায়ের শরীরটা বানিয়েছেন আল্লাহ। শিশুর খাবারের জোগান মিটবে। সুস্থ থাকার জন্য যতটুকু তাপ প্রয়োজন, তা পাওয়া যাবে মায়ের কোলেই। মায়ের মনটাও কেমন নরম। সন্তান লালন-পালন করার জন্য তাকে রাতের পর রাত না-ঘুমিয়ে কাটাতে হয়। তবুও কোনো রাগ নেই, অভিযোগ নেই। এভাবেই পৃথিবীতে টিকে থাকে মানুষের প্রজন্ম। মানুষের হাজার বছরের ইতিহাস এমনই। আমাদের বাবা-মা, দাদা-দাদি কিংবা তারও আগের কোনো প্রজন্ম—এই উপায়েই তারা জীবন কাটিয়েছেন।

মানুষের এই সুন্দর জীবনযাপন পছন্দ হয় না ওদের। শয়তান তো বলেই রেখেছে, তার আদেশে মানুষ বিকৃত করবে আল্লাহর সৃষ্টিকে।[৩২] শয়তানের অনুসারীরাও থেমে নেই। শয়তানের এই 'ওয়াদা' পুরা করবার জন্য আদাজল খেয়ে নেমেছে। এর ফলাফল কী? সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে বিকৃত আচরণ। কিছু কিছু পুরুষ যাচ্ছে পুরুষের কাছে! নারী যাচ্ছে নারীর কাছে!

এ অপরাধের জন্যই আল্লাহ তাআলা লূত আলাইহিস সালাম-এর গোটা জাতিকে মাটির নিচে চাপা দিয়েছিলেন। জমিনটা উপুড় করে ওদের ওপরে ফেলে দিয়েছিলেন।[৩৩] আর কিছু কিছু ছেলে-মেয়ে নাকি এ কাজে জড়াচ্ছে! ফারিহা দীঘির জলে একমনে তাকিয়ে

থাকে। ওখানে কতগুলো পরিযায়ী বুনো হাঁস খেলা করছে। শীত মরসুমে যথেষ্টই দেখা মেলে এদের। একটা হাঁস ডুব দিয়ে তো বেশ কিছুটা সময় উধাও। ফারিহা ভয় পেয়ে যায়। ওমা! হাঁসটাকে কুমির খেয়ে ফেলল কি না! তক্ষুনি মনে পড়ে এই দীঘিতে তো কুমির নেই। আরও কিছুক্ষণ পর দেখা গেল দীঘির ও প্রান্তে বুদ্‌বুদ ছড়িয়ে মাথা জাগিয়ে উঠল হাঁসটি। ফারিহা হাততালি দেয় একা একাই।

ফারিহা আবারও চিন্তায় পড়ে যায়। মিডিয়া ইদানীং সমকামিতা নিয়ে খুব হইচই করছে। কলেজের দু একজনকে কথাও বলতে শোনা যায়। অথচ সমকামীদের ওপর নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতটা রাগ দেখিয়েছেন। তিনি বদদুআ করেছেন, 'কেউ ওসব কাজে জড়ালে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন।' এভাবে তিনবার করে ধ্বংসের বদদুআ করেন তিনি।[৩৪]

এর মাঝে মৌরিকেও আসতে দেখা গেল এদিকে। কালো বোরকা পরেছে। মুখ ঢাকা। কে চিনবে মৌরিকে? সেদিনের পর থেকে মেসের সবাই আগের মতো চলতে শুরু করেছে। মেয়েরা সেদিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কতগুলো হায়েনার চোখ ঠান্ডা হবে আমাদের শরীর দেখে, তা হতে দেবো না। প্রয়োজনে হাত-মোজা, পা-মোজাও

পরব। এতে কেউ 'জীবন্ত তাঁবু' বললে বলুক। আমরা যত ঢেকে-ঢুকে থাকব, ভণ্ডগুলো তত বেশি জ্বলে-পুড়ে ছারখার হবে।

মৌরি এসে বসল। ফারিহাকে চিন্তিত দেখে বলল,

: কী রে, কী ভাবছিস?

ফারিহা পায়ের আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। ওভাবেই আঁকিবুকি করতে করতে বলল,

: তেমন কিছু না। তোর চোখে পড়েছে কিনা, সমকামিতা নিয়ে ইদানীং খুব আলাপ চলছে। মিডিয়া, এনজিও, শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো এই আলাপ জিইয়ে রাখছে। ওরা যে কী চায় তা-ই বুঝি না। দেখ, এতদিন ফ্রি-মিক্সিং উসকে দিয়েছে, ছেলে আর মেয়েদেরকে 'কাছে আসার গল্প' শুনিয়েছে। এখন ওরাই আবার মেয়ে মেয়ে সম্পর্ক করার কথা বলছে। ছেলে আর ছেলে ভালোবাসার কথা বলছে। এসব শুনলেও তো ঘেন্না হয়।

এখন মৌরিকেও কিছুটা চিন্তিত মনে হচ্ছে। ব্যাপারগুলো ওর নজরেও পড়েছে। দীঘির জলে চোখ ফেলে মৌরি বলল,

সমকামিতা একটা বিকৃত কাজ। একটা অবুঝ বালকও তা বোঝে। পুরুষ আর নারীর শরীরের গড়নের

দিকে তাকালেও বোঝা যায়। পুরুষের গড়নের ঠিক বিপরীত গড়নে নারীকে বানিয়েছেন আল্লাহ।

মৌরির কথায় সায় দেয় ফারিহা। কিছু দিন আগে প্রথম আলো একটা প্রতিবেদন ছাপল। 'সব গাছে পুরুষ ফুল বিপাকে তরমুজচাষি'। প্রথম আলোও স্বীকার করে, একটা খেতে সব যদি পুরুষ ফুল হয়, তাহলে ওখানে কোনো ফল হবে না। কৃষকের মাথায় হাত পড়বে। পুরুষ ফুলে পুরুষ ফুলে কখনো পরাগায়ণ হয় না। এ কারণে খেতে ফসলও আসবে না। তাহলে মানুষের বেলায় কেন না-বোঝার ভান করে? দুজন পুরুষ বা দুজন নারী একসঙ্গে থাকাটা ফলদায়ক নয়। বরং ক্ষতি ডেকে আনে। এইডস ছড়ায়। ছড়ায় আরও নানান রোগব্যাধি। এ কথাগুলো কেন বলে না ওরা?

মৌরি উত্তর দেয়, খুব ভালো পয়েন্ট। পশু-পাখি আর গাছ-গাছালির বেলায় ঠিকই মানে। কিন্তু মানুষের বেলায় এসেই ভোল পালটায়।

হঠাৎ একটা মাছরাঙা এসে বসল। বটগাছের শেকড়গুলো ঢালু হয়ে দীঘির ভেতর নেমে গেছে। ওরকম একটা শেকড়েই জায়গা পাতল। সাবধানি চোখ। ওত পেতে আছে। কয়েক মুহূর্ত না যেতেই ছোঁ মারল পানির ওপরে। একটা সরপুঁটি ঠোঁটে নিয়ে মুহূর্তেই উড়ে গেল।

ফারিহা আর মৌরি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। মাছরাঙার শিকারের নৈপুণ্য দেখে ওদের ভালো লাগে। আবার আলাপে ফেরে ওরা। ফারিহা বলল,

মানুষের যতগুলো জরুরি চাহিদা আছে, তার মধ্যে একটি হলো শারীরিক চাহিদা। বেঁচে থাকার জন্য খাবার যেমন দরকার, পরনের কাপড় যেমন দরকার, তেমনি মানসিক প্রশান্তির জন্য বিয়েটাও দরকার। এটা একটা বাস্তবতা।

দুঃখের কথা, আজ-কাল সমাজে বিয়ে করা কঠিন হয়ে গেছে। হালাল উপায়ে সম্পর্ক গড়ার সুযোগ কমে গেছে। ক্যারিয়ারের নামে বছরের পর বছর যুবক-যুবতীদের বিয়ে করা থেকে বিরত রাখা হয়। ছেলে-মেয়েদের হোস্টেলে পাঠিয়ে দিয়ে বাবা-মা নিশ্চিন্তে দিন কাটায়। খুব পড়াশোনা করছে! অথচ তার হাতে স্মার্ট ফোন। তার সময় কাটে ইন্টারনেট ব্রাউজ করে। ওদিকে ফেসবুকে সমকামী 'মিমস' ভাসে। সিনেমায় সমকামী দৃশ্য। হোস্টেলে দুজন ছেলে বা দুজন মেয়ে এক বিছানায় ঘুমায়। একটু চিন্তা কর মৌরি, তরুণ-তরুণীদের অবস্থা যখন এরকম, তাদের পথ হারাবার আশঙ্কা তখন কতটা বেড়ে যায়? সে তো পেন্ডুলামের মতোই দুলতে থাকে। যেকোনো সময় অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে।

ফারিহার কথাগুলো মৌরি খুব খেয়াল করে শোনে। আসলেই তো, উপযুক্ত সময়ে বিয়ে দিলে তরুণ-তরুণীরা কখনোই ওসব কাজে জড়াত না। বাবা-মায়েরাও কেন জানি বুঝতে চান না ব্যাপারগুলো। ক্যারেক্টারের চেয়ে এখন 'ক্যারিয়ার' বড় হয়ে গেছে। এ যুগের স্লোগান হওয়া দরকার—আগে ক্যারেক্টার পরে ক্যারিয়ার।

ফারিহাও মৌরির সাথে ঠোঁট মিলিয়ে বলে—আগে ক্যারেক্টার পরে ক্যারিয়ার।

কতগুলো ডুমুর পড়ে আছে পাশে। ছোট ছোট ছেলেপুলে এখানে বসে খেলা করে মাঝে মাঝে। ওরাই এনেছে হয়তো। ফারিহা একটা ডুমুর দীঘিতে ছুড়ে মারে। ঝুপ করে শব্দ হয়। ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে দীঘিতে। ভাসতে-থাকা শাপলা আর শালুক নেচে ওঠে। ফারিহা জিজ্ঞেস করল,

—ম্যাট ওয়ালশের নাম শুনেছিস মৌরি?

মৌরি না-সূচক মাথা নাড়ল। ফারিহা বলল,

—ম্যাট ওয়ালশ সম্প্রতি একটা বই লিখেছেন। বইটা সারা দুনিয়ায় আলোড়ন ফেলেছে। এর ওপর একটা ডকুমেন্টারিও তৈরি করেছেন তিনি।

মৌরি বলল,

—আগে বইয়ের নামটা তো বল।

ফারিহা উত্তর দেয়,

—বইয়ের নাম *হোয়াট ইজ আ উম্যান*। নারীর পরিচয় নিয়ে লেখা। ওখানে তিনি সমকামিতা, জেন্ডার আর ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে বিস্ময়কর কিছু আলাপ করেছেন। এই যেমন ধর, একটা মেয়ে কেন সমকামী হয়ে ওঠে, একটা ছেলে হঠাৎ কেন নিজেকে নারী দাবি করে, ওসবের পেছনের গল্প জানা যায় এ বই পড়লে।

ধরা যাক একটা মেয়ে হয়তো ফেসবুকে লিখল—'ভাল্লাগে না'। অথবা লিখল—'নিজেকে ইদানীং চিনতে পারি না'। ব্যস, চেইন ইফেক্টের মতো একটার পর একটা জিনিস তার সাথে ঘটতে থাকবে। বেনামি আইডি থেকে তার কাছে ম্যাসেজ আসে। ম্যাসেজের কথাগুলো অনেকটা এরকম,

তুমি কি সত্যিই নিজেকে চিনতে পারছো না? চিন্তার কথা! নিজেকে জিজ্ঞেস করো তো, তুমি কে। তুমি যে নারী এ ব্যাপারে কি তুমি নিশ্চিত? এমনও তো হতে পারে, তোমার মনটা কেমন ছন্নছাড়া। নিজেকে পুরুষের মতো মুক্ত-স্বাধীন মনে হয়।

তখন মেয়েটা হয়তো ম্যাসেজের উত্তরে লেখে—ধুর! বাজে কথা ছাড়ুন। আমি কেন পুরুষ হতে যাব। আমার নামটা মেয়েদের। আমি শরীরে নারী। আমার কণ্ঠ নারীদের। মাসে মাসে অসুস্থ হই। আমি কেন পুরুষ হতে যাব? আমি নারীই, এ ব্যাপারে ফালতু কথা বলবেন না।

বেনামি আইডি থেকে উত্তর আসে—রেগে যাচ্ছ তুমি। ওটা ফালতু কথা নয়। বিশ্বাস নাহলে তুমি এক কাজ করতে পারো। একদিন কিছু সময়ের জন্য পুরুষের পোশাক পরতে পারো। জিন্স, টি-শার্ট, জুতো আর বেল্ট।

মেয়েটা ধাঁধায় পড়ে যায়। পুরুষের ড্রেস পরে দেখবে কিনা একবার। এরপর হঠাৎ একদিন পুরুষের পোশাক পরে মেয়েটা। তার ভেতর একটু 'অন্যরকম' লাগে। সারাজীবন পরে এসেছে ঢিলেঢালা পোশাক। ফলে, এটা স্বাভাবিক—নতুন পোশাকে তার একটু অন্যরকম ঠেকবেই। পুরুষের টাইট পোশাক তার নরম শরীরটা চেপে ধরে। নিজেকে আগের চেয়ে কিছুটা শক্তিশালী মনে হয়।

আবারও টুং করে ম্যাসেজ আসে—কী, আমাদের কথা তো উড়িয়ে দিয়েছিলে। এবার তুমিই বলো ভিন্ন কিছু মনে হয়েছে কিনা তোমার।

মেয়েটা হ্যাঁ-সূচক উত্তর দেয়।

ব্যস! বল এখন ওদের কোর্টে। গেইম এখন ওদের নিয়ন্ত্রণে। মেয়েটিকে শত উপায়ে কনফিউজড করা হয়। তার ম্যাসেঞ্জারে জমা পড়ে সমকামী সিনেমা। তাকে সমকামীদের ব্লগ পড়তে দেওয়া হয়। সমকামী মেয়েদের নেটওয়ার্কে যুক্ত করা হয়। এভাবেই মেয়েটি চোরাবালিতে আটকে যায়। পা পিছলে পড়ে যায় নিষিদ্ধ গলির স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকারে। এখন মেয়েটি নিজেই শিকারের খোঁজে থাকে। তার নজর বান্ধবীর দিকে, রুমমেট মেয়েটার দিকে, ডিপার্টমেন্টের জুনিয়রের দিকে।

মৌরি কান্না করছে। চোখের পানিতে গাল ভিজে গেছে। ফারিহা অবাক হয়। এমন কিছু তো বলিনি যে—কষ্ট পেতে পারে মৌরি। ফারিহা বিস্ময়-মাখা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে,

—কী হয়েছে-রে মৌরি? কাঁদছিস কেন? আমার কথায় কষ্ট পেয়েছিস?

মৌরি চুপ। কোনো কথা নেই মুখে। আরও কিছুক্ষণ কাঁদে। স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে। ফারিহা মৌরির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আর মৌরির চোখ দীঘির জলে। ভাবনার ছাপ ওর চোখে-মুখে। তারচেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে মুখ-ভরতি বিষণ্নতার ছায়া। মৌরি বলল,

—একই ঘটনা আমার সাথেও ঘটেছে।

মৌরির কথা শুনে চমকে ওঠে ফারিহা। বলিস কী?

—হ্যাঁ, তুই যা যা বলেছিস, তা-ই ঘটেছে আমার সাথে। আমিও ওরকম একটা পোস্ট দিয়েছিলাম সেবার ফেসবুকে। খুব যে মন খারাপ ছিল তা-ও না। ফেসবুকে যেটা হয়, সবকিছু বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে সবাই। আমিও একটু বাড়িয়েই লিখেছিলাম, 'চেনা মানুষগুলোকেও ইদানীং খুব অচেনা লাগে। কেউ-ই বুঝতে চায় না আমাকে। ইচ্ছে হয় হারিয়ে যাই কোনো অজানায়।'

এই একটা পোস্টই বদলে দেয় সব। সেদিন-যে আমি জিন্স আর টপস কিনে আনলাম, তখন একজোড়া জুতো আর দুটো টি-শার্টও কিনেছিলাম। কিন্তু তোদেরকে দেখাইনি। ওসব আমি সাধে কিনিনি। আমাকে কিনতে জোর করা হয়েছিল ম্যাসেঞ্জারে। সেদিন ছাদে-যে কাপড়গুলো পুড়িয়ে ফেলা হলো, তখন আমি টপসটাই কেবল পুড়িয়েছিলাম। বাকি সব আমার কাছেই ছিল।

এরপর এক শুক্রবারের কথা। তোরা গিয়েছিস বাড়িতে। আমি মেসে একা। সেদিন সন্ধ্যার পর আমি জুতো, জিন্স আর টি-শার্ট পরে বেরিয়েছিলাম। শহরের অনেকটা জায়গা ঘুরেছি। তুই যেসব বর্ণনা দিলি, আমার মনেও সেসব ভর করেছিল। ভাবছিলাম, পুরুষ হলে তো

মন্দ হতো না। শরীরে একটা ভাব আসে। শক্তিশালী মনে হয় নিজেকে।

কিন্তু জানিস, ওরা আমাকে ট্রান্সজেন্ডার হতে জোর করছিল। বারবার বলছিল, পুরুষের পোশাক পরে যেহেতু তোমার ভালো লেগেছে, এখন আর কী। অপারেশন করিয়ে পুরুষই হয়ে যাও। ওরা আমাকে টাকা-পয়সার লোভও দেখিয়েছে। লন্ডনের ভিসা দেবে, বড় এনজিওতে লাখ টাকা বেতনে চাকরি দেবে, আরও কত কী। জানিস ফারিহা, আমি তখন ভীষণ ভয় পেয়ে যাই। আমি বুঝতে পারছিলাম, লোকগুলো ভয়ংকর খারাপ। ওরা যেন মাফিয়া। আমি সাফ জানিয়ে দিলাম, আমি মরে গেলেও আমার শরীরে কাটা-ছেঁড়া করতে দেবো না। প্রচণ্ড বকাঝকা করেছিলাম সেদিন।

কিন্তু আমি তখনো বুঝতে পারিনি, ওদের নেটওয়ার্ক কত বড়! ওরা আমাকে খুন করে ফেলার ভয় দেখায়। কলেজ থেকে বের করে দেবে, এমন হুমকিও দেয়। এক পর্যায়ে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে আমি মোবাইল-সিম-ফেসবুক সব বন্ধ করে রাখি।

ফারিহার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে আসে। ওর কণ্ঠ জুবে গেছে পুরোপুরি। ম্যাট ওয়ালশের বইটা পড়ার সময় কোনো দিন কল্পনাও করেনি, এই ঘটনা বাংলাদেশেও ঘটবে। সেখানে নিজের সবচেয়ে কাছের বান্ধবীই নাকি

এই ঘটনার শিকার! ফারিহার দম বন্ধ হয়ে আসে। মৌরিও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আরও কিছুটা সময়ের জন্য নীরবতা নামল রানি দীঘির পাড়ে।

মৌরি আবার শুরু করে—তারপর টানা দশ দিন আমার মোবাইল বন্ধ। আমি ভেবেছি, ব্যাপারটা হয়তো ওখানেই শেষ। কিন্তু গত পরশু আমার সাথে যা ঘটল, তার বর্ণনা দেবার ভাষা আমার নেই। ডিপার্টমেন্টের এক ম্যাডাম আমাকে ক্লাস শেষে তার রুমে দেখা করতে বললেন। আমি তার নাম বলব না। নাম বললে নাকি আমাকে আস্ত রাখবে না। রুমে ঢোকার পর ম্যাডাম দুটো কথা বললেন আমাকে। 'মৌরি, বাঁচতে চাইলে ওদের কথামতো কাজ করো। সার্জারি করাতে রাজি হয়ে যাও। তোমার মনটা তো পুরুষের, একটা ভুল দেহে তোমার মনটা আটকা পড়েছে। এখন সার্জারি করিয়ে দেহটা পালটে ফেললেই হলো। সার্জারির খরচাপাতি নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। সব ওরাই বহন করবে। আরেকটা কথা, এর কোনোকিছু যদি বাইরে ফাঁস করো, তাহলে কিন্তু আর বাঁচতে পারবে না।'

ফারিহা এবার কেঁদে ফেলে। আমাদের একজন ম্যাডামও এর সাথে জড়িত? তার মানে আমরা ওদের হাতের নাগালেই! ওরা আমাদের ম্যাডাম আর ক্লাসমেটদের মাধ্যমে আমাদের ফেসবুক আইডি ও

চলাফেরার ওপর নজর রাখছে। মৌরি, বিশ্বাস কর, ম্যাট ওয়ালশ এটাও বলে রেখেছেন—কোনো ছেলে বা মেয়ে যাতে ফেসবুকে নিজের হতাশা প্রকাশ করে পোস্ট না দেয়। 'ভাল্লাগে না', 'হতাশ লাগে', 'কেউ আমাকে বুঝতে চায় না', 'আমার সাথেই কেন এমন হয়'—এই টাইপের ন্যাকামি যারা করে, তাদেরকেই ওরা টার্গেট করে।

এ কারণেই নারীর জন্য পুরুষের পোশাক পরা নিষেধ। পুরুষের মতো পুরুষ হতে হবে, নারীর মতো নারী হতে হবে। এতে নারী-পুরুষের ফারাকটা স্পষ্ট থাকে। এমন কিছু করা যাবে না যে—পরিচয় নিয়ে কোনো সংশয় তৈরি হয়, নারী-পুরুষের পরিচয় নষ্ট হয়ে যায়। ইসলাম এ-ব্যাপারে কোনো রকমের ছাড় দেয় না।

শৈশব থেকেই সন্তানকে এভাবে গড়ে তুলতে হবে। মেয়ে-শিশু বেড়ে উঠবে নারীর মতো। ছেলে-শিশু বেড়ে উঠবে পুরুষের মতো। আপনার পাঁচ বছরের মেয়েটিকেও জিন্স পরা দেখলে আপনাকে প্রচণ্ড রেগে যেতে হবে। সাথে সাথে স্ত্রীকে বলুন, ওর পোশাক জিন্স প্যান্ট নয়। ওকে ওর পোশাক পরাও। একজন মুসলিমের এমনই হওয়া দরকার। আপনার ছেলে-শিশুটি যেন কোনোভাবেই মেয়েলি ঢঙে কথা না বলে, মেয়েলি আচার-আচরণ নকল না করে।

মৌরি কাঁদছে। ফারিহার চোখে পানি। ওরা তখনো তাকিয়ে আছে দীঘির জলে। জীবনটা যদি দীঘির জলের মতোই শান্ত হতো। আর মানুষগুলো যদি হতো ফুটন্ত শাপলার মতোই পবিত্র।

মৌরির জন্য আর কী অপেক্ষা করছে, তা আমরা জানি না।

মৌরি কি খুন হবে?

প্রিয় পাঠক, *মনে মনে প্রধানমন্ত্রী* স্মার্ট বুকটি সবার হাতে হাতে পৌঁছে দিতে আমরা একটি উৎসবমুখর আয়োজন করেছি। স্বাভাবিকভাবে ডিসকাউন্ট দিয়ে বইটির দাম ১৫০ টাকা হলেও ছোট্ট কিন্তু উপকারী এ বইটিকে উপহার দেয়ার জন্য আমাদের বিশেষ অফারমূল্য ঘোষণা করছি। উপহার হিসেবে বইটিকে সহজে ছড়িয়ে দিন আপনিও। সেক্ষেত্রে:

২ কপি — ২০০ টাকা
৫ কপি — ৪০০ টাকা
১০ কপি — ৬৫০ টাকা